নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

Date: 03.01.2018 Page: 06

ধানের ৫টি নতুন জাত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা পাঁচটি নতুন জাতের ধানবীজ উদ্ভাবন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে আবাদের জন্য নতুন বীজ ধান জাতীয় কারিগরি কমিটির অনুমোদনও পেয়েছে। নতুন পাঁচটি জাতের মধ্যে তিনটি আউশ মৌসুমের এবং দুটি বোরো মৌসুমের। আরও বিশেষত্ব হচ্ছে, নতুন ধান আবাদের মাধ্যমে কৃষক পাবেন উচ্চ ফলন, অন্যদিকে সময়ও লাগবে কম। আরও যা উল্লেখ্য তা হলো, নতুন ধানের মধ্যে ব্রি ৮৬ জাতটিতে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে জৈবপ্রযুক্তি। এর চালে এ্যামাইলেজের পরিমাণ ২৫ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ১০ শতাংশ। সদ্য উদ্ভাবিত এই জাতটি উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রতি হেক্টরে ফলন হতে পারে সর্বোচ্চ আট টন। ফলে পুষ্টিহীনতার পাশাপাশি দূর হবে খাদ্য সঙ্কট ও খাদ্যাভাব। অভিনন্দন ব্রি'র বিজ্ঞানীদের।

বর্তমান বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সীমিত বদ্বীপ ভূখন্ডে এটি একটি অভাবনীয় সাফল্য নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশ এখন ধান-চাল উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাল রফতানিও করে। আর এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কৃষকদের। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আদলে তৈরি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা দেশের জল হাওয়ার উপযোগী উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ও বীজ একের পর এক উদ্ভাবন করে ধান-চাল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছেন। বিভিন্ন জাত ও মানের উফশী জাতের মানসম্মত ধানের পাশাপাশি তারা উদ্ভাবন করেছেন খরা ও লবণাক্ত মাটিসহিষ্ণু ধান। সম্প্রতি রংপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আমন মৌসুমের জাত হিসেবে ব্রি-৭৫ আগাম জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন দীর্ঘ গবেষণা করে। এই ধানবীজটি রংপুর বিভাগ তথা উত্তরাঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী এবং মাত্র ৮০ দিনে ফলন হয় হেক্টর প্রতি ৫ টনেরও বেশি। বিজ্ঞানীদের আশা আগাম জাতের এই ধান এ অঞ্চলে আমন মৌসুমে আবাদ করা গেলে অতিরিক্ত আরও ৫ লাখ টন ধান উৎপাদিত হবে। এতে একদিকে যেমন পূরণ করা সম্ভব হবে চালের ঘাটতি, অন্যদিকে দূর করা যাবে কার্তিকের মঙ্গা পরিস্থিতি। অনুরূপ লবণাক্তসহিষ্ণু মাটিতে ধানের চাষ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল, সুন্দরবন উপকূল, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, টেকনাফ ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায়। এসব বিরল উদ্ভাবনের জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

বর্তমান বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সীমিত বদ্বীপ ভূখন্ডে এটি একটি অভাবনীয় সাফল্য নিঃসন্দেহে

ধানের পরই বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী কৃষিপণ্য পাট। পাটের জেনোম তথা বংশগতির মানচিত্র উদ্ভাবন করে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম ও তার দল তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পাটের মেধাস্বত্ব তথা প্যাটেন্ট রাইট সুরক্ষার জন্য আবেদনও করেছে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে। এই আবিষ্কার ও স্বত্বাধিকারের ফলে বাংলাদেশ উফশী ও উন্নত জাতের পাট উৎপাদনের পাশাপাশি অতি সূক্ষ্ম পাটতন্তু তৈরি করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় একচ্ছত্র প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হতে পারে। তবে এর জন্য চাই পাট নিয়ে আরও উচ্চ ও উন্নততর নিরন্তর গবেষণা এবং এর সঠিক ব্যবহার। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানীদের জন্য চাই আরও প্রণোদনা ও অনুপ্রেরণা। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্মত গবেষণাগারের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ সীমিত এবং আর্থিক বরাদ্দও সীমাবদ্ধ। ফলে বাংলাদেশের প্রতিভাবান ও মেধাবী বিজ্ঞানীরা প্রায়ই উন্নত বেতন ও গবেষণার আকর্ষণে বাইরে চলে যান। তদুপরি গবেষণাগারে যেসব বিজ্ঞানী দিনরাত কাজ করেন তাদের সৃজনশীল কাজটি ১০টা-৫টা নিয়মিত অফিসের মতো হলে চলে না। বরং নতুন কিছু একটা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এটা নিয়েই ভাবিত থাকতে হয়। নিজের এবং সংসারের দিকেও মন দিলে চলে না তাদের। সেক্ষেত্রে ধান-পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো সৃজনশীল গবেষণাগারে যারা কাজ করেন, তাদের বেতন-ভাতা সুযোগ-সুবিধা-প্রণোদনা নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে হবে সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয়কে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনে বাড়াতে হবে আর্থিক বরাদ্দ। আর তাহলেই বিজ্ঞান গবেষণায় ইচ্ছুক মেধাবী ও প্রতিভাবানদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। সরকার এদিকে সবিশেষ মনোনিবেশ করবে বলেই প্রত্যাশা।